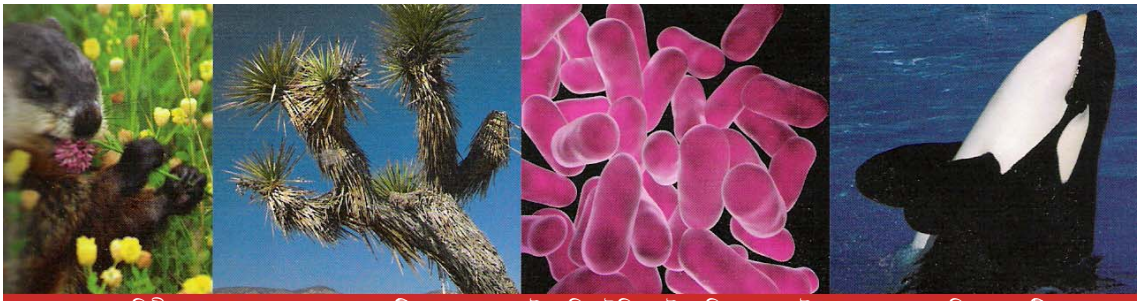

আমাদের পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর। প্রাণের উৎপত্তির ইতিহাসটাও কিন্তু খুব ছোট নয়। প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে প্রাণ উৎপত্তির উষালগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাজারো, লক্ষ কোটি জীবের উৎপত্তি ঘটেছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে কালের পরিক্রমায়। ফসিল রেকর্ড বলে, অনবরত অগুনতি প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে, সেই কবে থেকে প্রাণের সমারোহে মুখরিত হয়ে আছে আমাদের এই গ্রহ। কেন এত ধরণের প্রাণের সমারোহ এবং বৈচিত্র আমাদের চারপাশে? আমরা এলাম কোথা থেকে? আমরাও কি এই প্রকৃতিরই অংশ? এই ধরণের প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে, পৃথিবীতে প্রাণের রহস্য বুঝতে হলে আমাদের বিবর্তনবাদ বুঝতে হবে। আজকে চিকিৎসাবিদ্যা থেকে শুরু করে জেনেটিক্স, জিনোমিক্স, বা আণবিক জীববিদ্যার মত জীববিজ্ঞানের সমস্ত শাখার খুঁটি হিসেবে ধরা হয় এই বির্বতনবিদ্যাকে।

বিবর্তন তত্ত্ব আজকে আমাদের শুধু প্রাণের বিকাশ, বিলুপ্তি এবং টিকে থাকার ব্যাপারটাই বুঝতে সাহায্য করছে না, আজকের এই জীবজগৎ কি করে ক্রমাগতভাবে বদলে যাচ্ছে এবং তা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে কিভাবে প্রভাবিত করছে তার একটা পূর্ণাংগ ব্যাখ্যাও দিচ্ছে। বিবর্তনবাদ না বুঝলে আজকে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা, ওষুধ বা কীটনাশক তৈরি, পরিবেশ দূষণরোধ থেকে শুরু করে জীববিদ্যার সকল শাখাই অকেজো হয়ে পড়বে।

অ্যান্টিবায়োটিকের অতিপ্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগের ফলে আজকে পৃথিবী জুড়ে নতুন নতুন প্রতিরোধক ব্যকটেরিয়ার উদ্ভব হচ্ছে, যাদের উপর প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকগুলো আর কাজ করতে পারছে না। কিভাবে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর বিবর্তন ঘটে তা বুঝার উপরই নির্ভর করছে এ সমস্যার সমাধান। যে কোন অ্যান্টিবায়োটিক তৈরীর পেছনে বিবর্তন তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

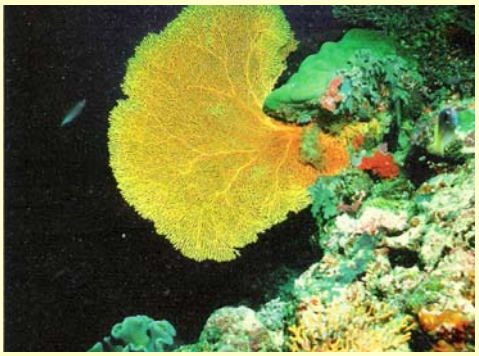

আমাদের চারদিকে এ বৈচিত্রময় পরিবেশ একদিনে তৈরি হয়নি, কোটি কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এর উদ্ভব ঘটেছে। এই প্রবাল দ্বীপ বা গভীর অরণ্য থেকে শুরু করে আমাদের চারপাশের প্রকৃতি মানুষের অজ্ঞতা, অপব্যবহার এবং অবহেলায় বিপর্যস্ত হওয়ার পথে। আমাদের নিজেদের টিকে থাকার স্বার্থেই এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

দিনের পর দিন শক্তিশালী কীটনাশক প্রয়োগ করে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি করে চলেছি। তাই বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীরা কীটনাশক প্রয়োগের বদলে জৈব উপায়ে শস্যের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ দমনের চেষ্টা চালাচ্ছেন। পাশের ছবিতে সয়াবিনের জন্য ক্ষতিকর এক ধরণের কীট দেখানো হয়েছে।

ফসিলগুলো পৃথিবীর দীর্ঘ প্রায় চারশ কোটি বছরের প্রাণের ইতিহাসের সরাসরি সাক্ষী, তারা ধারণ করে রেখেছে এই গ্রহে প্রাণের অফুরন্ত কোলাহলের নীরব পদচিহ্ন। পৃথিবীর উৎপত্তির পর প্রায় একশ কোটি বছর যাবত কোন জীব ছিল না। আমরা ৩৮০ কোটি বছর আগেকার প্রথম জীবাশ্মের সাক্ষাৎ পাই। এসব জীব আসলে ব্যকটেরিয়া আর নীলাভ শৈবাল জাতীয় অনুজীব।

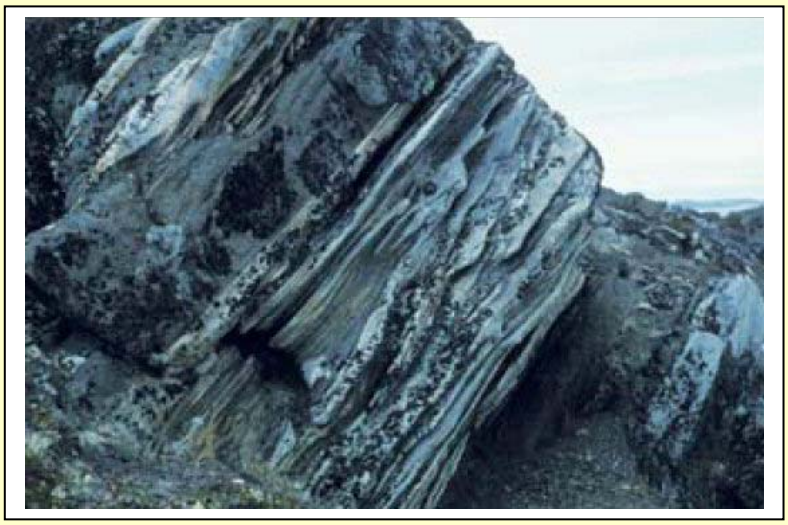

গ্রীনল্যান্ডের ছোট্ট পাহাড় আকিলার দক্ষিণে সাদা দাগ গুলোর মধ্যে জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গেছে। এগুলো ৩৮০ কোটি বছরের বেশী পুরোন।

অস্ট্রেলিয়ার শার্ক অববাহিকায় গড়ে ওঠা স্ট্রোমাটোলাইটের ছবি। ৩৫০ কোটি বছরের পুরোন এই জীবাশ্মের সাথে আধুনিক সায়নোব্যকটেরিয়ার মিল পাওয়া যায়।

গত শতাব্দীতেই বিবর্তনবাদকে জীববিজ্ঞানের মূল শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ডারউইন এই বিবর্তন তত্ত্ব প্রস্তাব করছিলেন প্রায় দেড়শো বছর আগে। তার আগে এবং পরে, ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে হাজার হাজার প্রজাতির ফসিলের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন একটাও ফসিল পাওয়া যায়নি যা প্রাণের বিবর্তনের ধারাবাহিকতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়।

সাড়ে ছয় লাখ বছর আগের অ্যামোনাইটের ফসিল (উপরে)।

২০০৪ সালে চীনে এক প্রত্নতত্ত্ববিদকে মাটি খুঁড়ে ডায়নোসরের ফসিল বের করতে দেখা যাচ্ছে (ডানে)

লুসির সন্তানঃ আশির দশকের প্রথম দিকে যখন ৩২ লক্ষ বছরের পুরনো *Australopethicus afarensis*-এর প্রায় সম্পুর্ন ফসিলটি পাওয়া যায় তখন বিজ্ঞানীমহলে রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছিল। একেই সেই বিখ্যাত 'লুসি' নামে অভিহিত করা হয়, যার মধ্যে মানুষ এবং বনমানুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান ছিল। ২০০৬ সালে বিজ্ঞানীরা একই প্রজাতির ৩৩ লক্ষ বছরের পুরনো তিন বছরের শিশুর ফসিল খুঁজে পেয়েছেন। এই প্রথম এত ছোট শিশুর এত পুরনো এবং সম্পুর্ণ ফসিল পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞানীমহলে এ নিয়ে উত্তেজনার সীমা পরিসীমা নেই। ফসিলটির পায়ের হাড়, হাটুর জয়েন্ট, ছোট আঙ্গুলগুলো, দাঁত বা মস্তিষ্কের আকার ও গঠনের অনুপাত থেকে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সন্তানধারণ, লালন পালন এবং শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কে গভীর ধারণা লাভ করতে পারবো।

মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্কগুলোতে কোন জীবের পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী প্রজাতিতে বিবর্তনের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায়। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা প্রায়ই দাবী করেন যে, এ ধরণের কোন ফসিল নাকি কখনও পাওয়া যায়নি। যারা বিবর্তনবাদ সম্পর্কে একটু আধটু খবর রাখেন তারা সবাই জানেন যে এই দাবীটি কত মিথ্যা। বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এত ধরণের মধ্যবর্তী ফসিলের সন্ধান পেয়েছেন যে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির বিবর্তনের ব্যাপারটা জলের মতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পা-ওয়ালা তিমি মাছ : চার কোটি বছর আগের Dorudon atrox-এর ফসিল। সম্পূর্ণ জলচরী হওয়া সত্বেও এর তখনও পা সদৃশ উপাঙ্গ বিদ্যমান ছিল। এটি তিমি মাছের চারপায়ী স্তন্যপায়ী পূর্বপুরুষ এবং আধুনিক তিমির মধ্যবর্তী অবস্থার ফসিল।

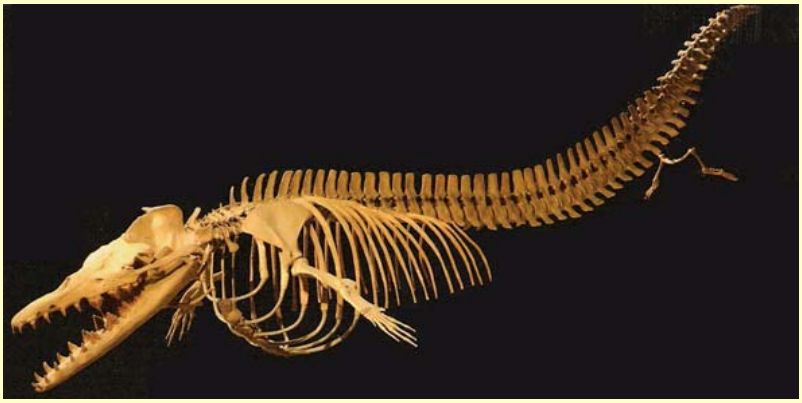

টিকটালিকঃ ২০০৬ সালে বিজ্ঞানীরা এই মাছ এবং চতুষ্পদী প্রাণীর মধ্যবর্তী ফসিল টিকটালিক (Tiktaalik roseae)-এর সন্ধান পান। প্রায় সাড়ে ৩৭ কোটি বছর আগের এই প্রাণীটির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে মাছের মত পাখনা, আদি চোয়াল এবং আঁশ, আবার অন্যদিকে আছে চতুষ্পদী প্রাণীর মত করোটি, ঘাড়, পাঁজড়ের হাড় এবং আংশিক হাত ও পায়ের অস্তিত্ব!

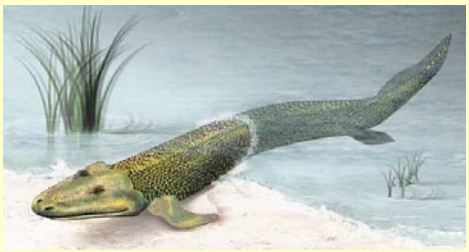

আরকিওপটেরিক্সঃ ১৫ কোটি বছর আগের পাখি এবং ডায়নোসরের মধ্যবর্তী ফসিল বা মিসিং লিঙ্ক। এদের গায়ে পাখীর মত পালক থাকলেও তখনও সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যগুলোও বিদ্যমান ছিল (নীচে)।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডিএনএ আবিষ্কারের পর বংশগতীয় গবেষণার নতুন দুয়ার খুলে যায়। কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এতদিন পর্যন্ত পাওয়া ফসিল রেকর্ডের সাথে আনবিক জীববিদ্যা এবং জেনেটিক্সের গবেষণালব্ধ ফলাফলগুলো দারুণভাবে মিলে যাচ্ছে। আধুনিক জীববিদ্যার এমন কোন শাখা নেই যা এ মুহূর্তে বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করছে।

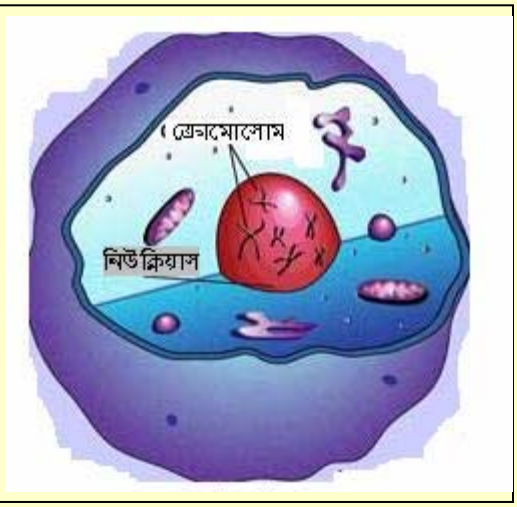

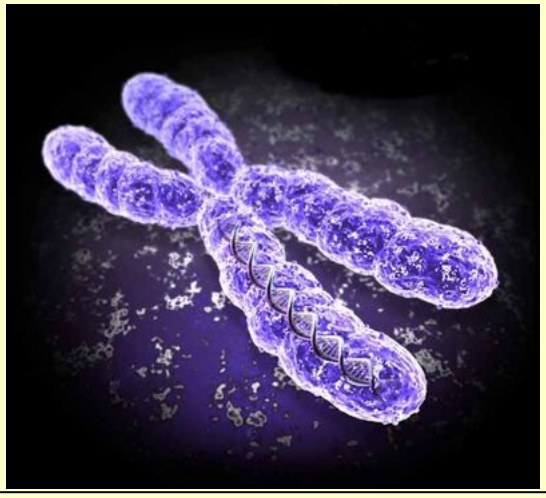

উপরে পাশাপাশি দুটি ছবিতে যথাক্রমে কোষ এবং ক্রোমোজোম দেখানো হয়েছে। পাশের ছবিতে ক্রোমজোমের গঠন এবং নীচে ডিএনএ-এর গঠন দেখানো হয়েছে।

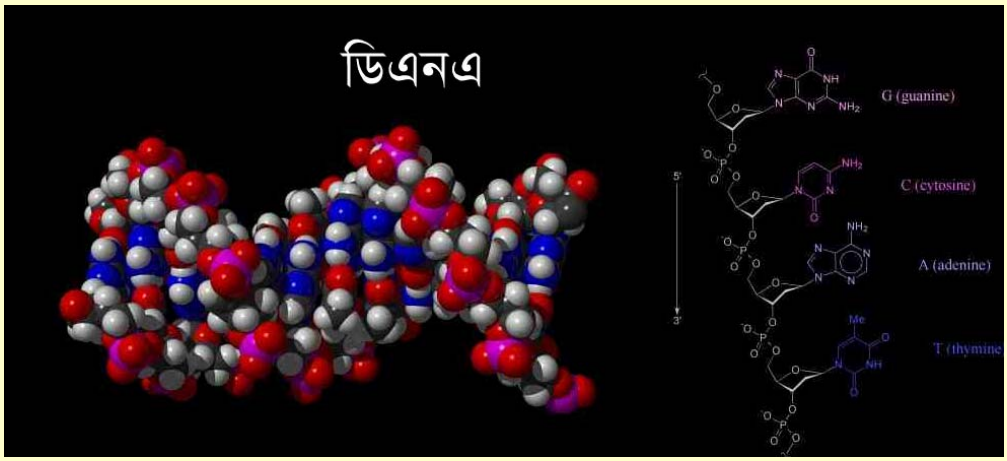

জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের মতে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলেও জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ন এবং তাদের ডিএনএ-এর ভিতরে জিনের মধ্যে লেখা বংশগতীয় তথ্য থেকেই জীবের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

পৃথিবীব্যাপী বিশটি দেশের বিজ্ঞানীরা হিউম্যান জিনোম প্রোজক্টে অংশগ্রহন করেন। ২০০৩ সালে এর কাজ শেষ হয়, বিজ্ঞানীরা মানুষের ডিএনএ তে ২০-২৫ হাজার জিনের সন্ধান পেয়েছেন এবং ডিএনএ এর ভিতরে যে ৩ বিলিয়ন রাষায়নিক base pairs রয়েছে তাদের অনুক্রমও বের করেছেন। উপরের ছবিতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে দেখানো হয়েছে।

জিনের বিশ্লেষণ থেকে আমরা পারিবারিক বংশগতীয় ইতিহাস, বিবর্তনের দীর্ঘ ইতিহাস থেকে শুরু করে, অপরাধী সনাক্তকরণ কিংবা জটিল রোগের জন্য দায়ী কারণগুলো পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারি। বিবর্তনের ইতিহাসে কাছাকাছি প্রাণীদের জিনোমের তুলনা থেকে তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। শিম্পঞ্জিরা আমাদের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়। মাঝের ছবিতে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের জিনোমের তুলনা দেখানো হয়েছে। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য প্রায় ৯৯%, এবং তাদের প্রোটিনের গঠনও খুব কাছাকাছি।

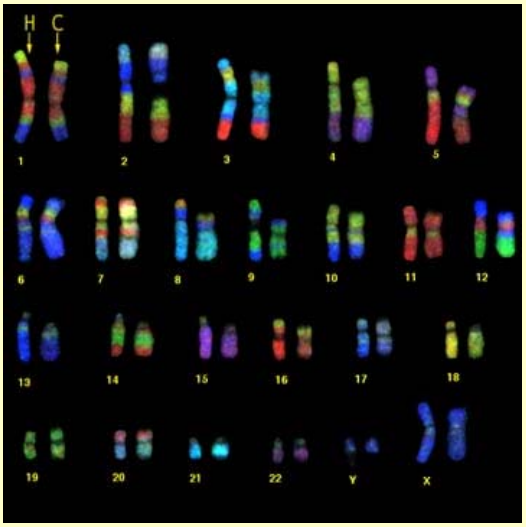

নীচের ছবিতে শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের প্রথম পাঁচটি ক্রোমজমের তুলনা দেখানো হয়েছে। শিম্পাঞ্জিদের ১২ এবং ১৩ নম্বর ক্রোমোজোম দু'টো মুখোমুখীভাবে সংযুক্ত হয়ে মানুষের মধ্যে ক্রোমোজোম ২ তৈরি করেছে।

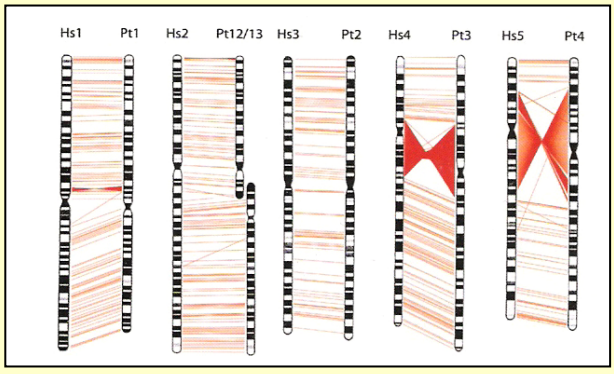

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা প্রক্রিয়া লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধাপে ধাপে ঘটে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাংগ গঠন দেখে মুগ্ধ হই তা একদিনে তৈরি হয়নি, তা বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তারা দাবী করেন যে চোখের মত একটি জটিল অঙ্গ কোনভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মত অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (cumulative selection)। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে যে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভুত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে।

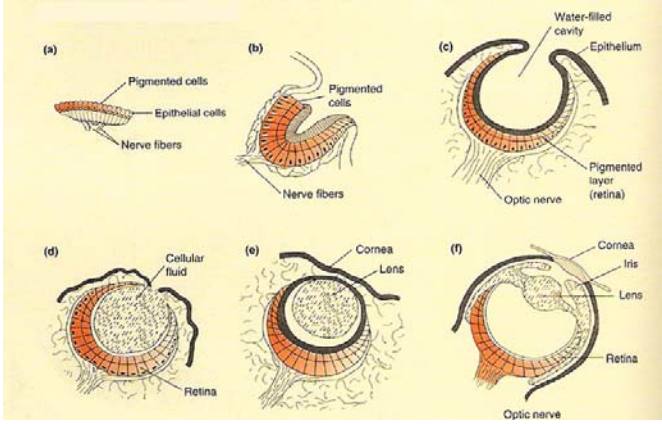

পাশের ছবিতে প্রকৃতিতে পাওয়া বিভিন্ন প্রাণীর চোখ দেখানো হয়েছে। সী-স্লাগের রয়েছে আলোর প্রতি সংবেদনশীল বিন্দু সদৃশ চোখ। আবার নটিলাসের রয়েছে পিন-হোল ক্যামারা-সদৃশ চোখ। অক্টোপাসের রয়েছে লেন্স ও রেটিনার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জটিল চোখ। জটিল চোখ রয়েছে সরিসৃপেরও। শেষ ছবিতে দেখানো হয়েছে মানুষের চোখ। উপরের ছবিতে মোলাস্কের চোখের বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ দেখানো হয়েছে।

বিভিন্ন প্রাণীর শারীরিক গঠনের মধ্যে সাদৃশ্য থেকে বোঝা যায় যে তারা একই উৎস থেকে বিবর্তিত হয়েছে। এখন আমরা আধুনিক জেনেটিক্স-এর জ্ঞান থেকেও জানতে পারছি যে, এরকম বিভিন্ন প্রাণীর ডিএনএর মধ্যেও লক্ষ্যণীয় মিল দেখা যায়। একই ভাবে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে এখনও বিদ্যমান বিলুপ্তপ্রায় এবং অপ্রয়োজনীয় অংগগুলো বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে।

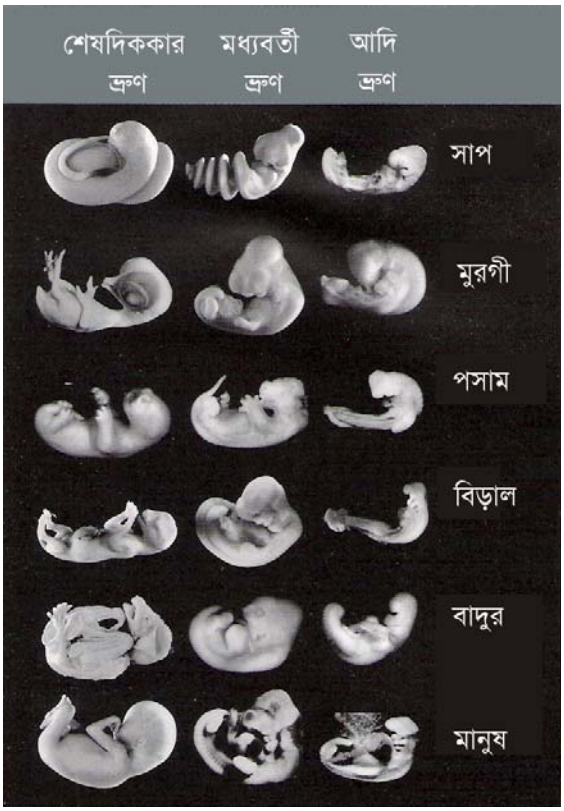

সাধারণ পুর্বপূরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলেই সব মেরুদন্ডী প্রাণীর ভ্রূণ শুরুতে একই রকম দেখায়। এমনকি প্রথমে শ্বাস জালিকার সংখ্যাও সমান থাকে, তারপর ভ্রূণের বয়স যত বাড়তে থাকে এই বাহ্যিক সাদৃশ্য তত কমে আসে (পাশের ছবি) ।
উপরের ছবিতে পাঁচ সপ্তাহ বয়সী মানব ভ্রূণের মধ্যে লেজ এবং শ্বাস জালিকার অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অগ্রপদের মধ্যে কি অস্বাভাবিক মিলই না দেখা যায়! ছবিতে দেখা যাচ্ছে পাখি, ব্যাঙ, বাদুর, তিমি, বিড়াল, টিকটিকি এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম।

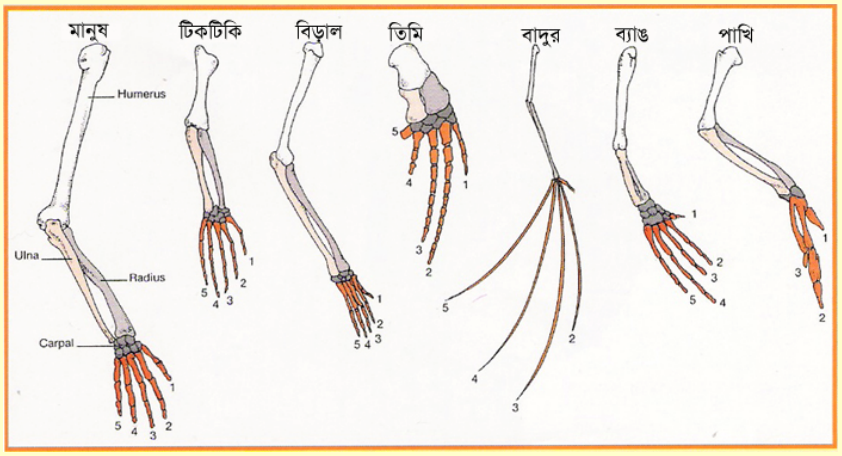

বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্যে আমরা সহজেই প্রকৃতিতে জীবের অভিযোজন, সহবিবর্তন আর মিথোজীবিতাকে ব্যাখ্যা করতে পারি, আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি বিভিন্ন জীবের মধ্যকার বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ককে। পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশ এবং নান্দনিকতাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বিবর্তন তত্ত্ব অত্যন্ত সফল একটি তত্ত্ব।

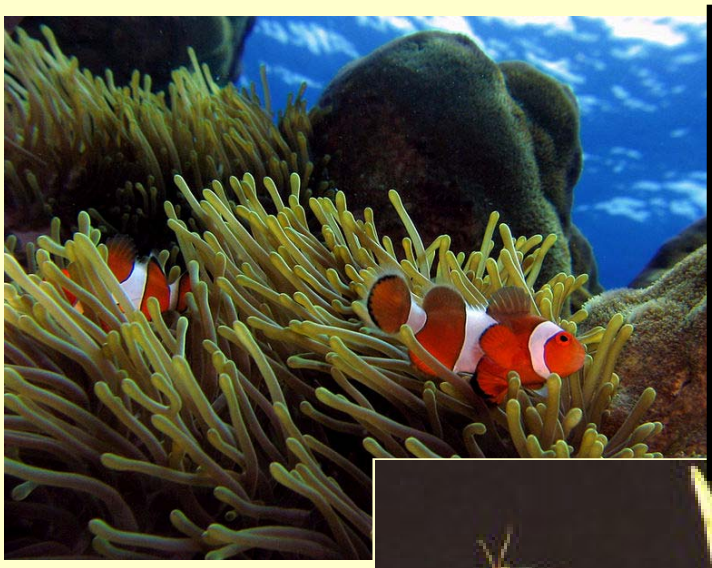

ক্লাউন মাছগুলো মিথোজীবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের মাছ তার গাঢ় রঙের কারণে সহজেই অন্যের শিকারে পরিণত হতে পারে, আত্মরক্ষার জন্য গাঢ় রঙের সামুদ্রিক এনিমোনের শুঁড়ের ভিতর প্রায়শঃই আত্মগোপন করে। এভাবে ক্লাউন মাছগুলো শিকারী মাছের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সমর্থ হয়। আবার অন্যদিকে এনিমোনগুলোও ক্লাউন মাছের কারণে উপকৃত হয়। কারণ ক্লাউন মাছগুলো এনিমোনভোগী ছোট মাছকে তাড়িয়ে দেয়।

ডারউইন লন্ডনের এক গ্রীন হাউসে মাদাগাস্কারের বিশেষ একটা অর্কিড দেখেন যার মধু রাখার পুষ্পাধারটি ১১ ইঞ্চি লম্বা । তিনি তা দেখে মন্তব্য করেন যে, মাদাগাস্কারের যে জায়গায় এই অর্কিডটা দেখা যায়, সেখানে এমন এক ধরনের মথ জাতীয় কোন পোকা থাকতেই হবে যাদের সুর বা হুল হবে একই রকমের লম্বা। কারণ এই লম্বা মধুর পুষ্পাধারের ভিতর শুর ঢুকিয়ে মধু খাওয়ার সময়ই মথগুলো অর্কিডটার পরগায়ন ঘটাবে। এবং তাইই হলো - কয়েক দশক পরে বিজ্ঞানীরা ঠিকই খুঁজে পেলেন সেই মাদাগাস্কার স্ফিংস মথ Xanthopan morganii praedicta।

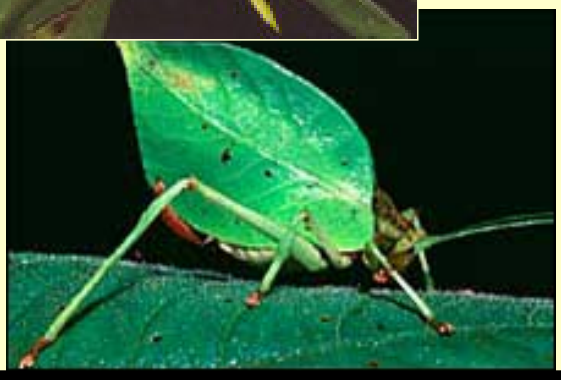

প্রকৃতিতে টিকে থাকার জন্য অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যেই এ ধরণের সহযোগীতার সম্পর্ক দেখা যায়, এবং নিজেদের প্রয়োজনে তারা দুজনেই অভিযোজিত হতে থাকে। আর একেই বলে সহ-বিবর্তন (co-evolution)।

কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের মতে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলেও জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ন এবং তাদের ডিএনএ-এর ভিতরে জিনের মধ্যে লেখা বংশগতীয় তথ্য থেকেই বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

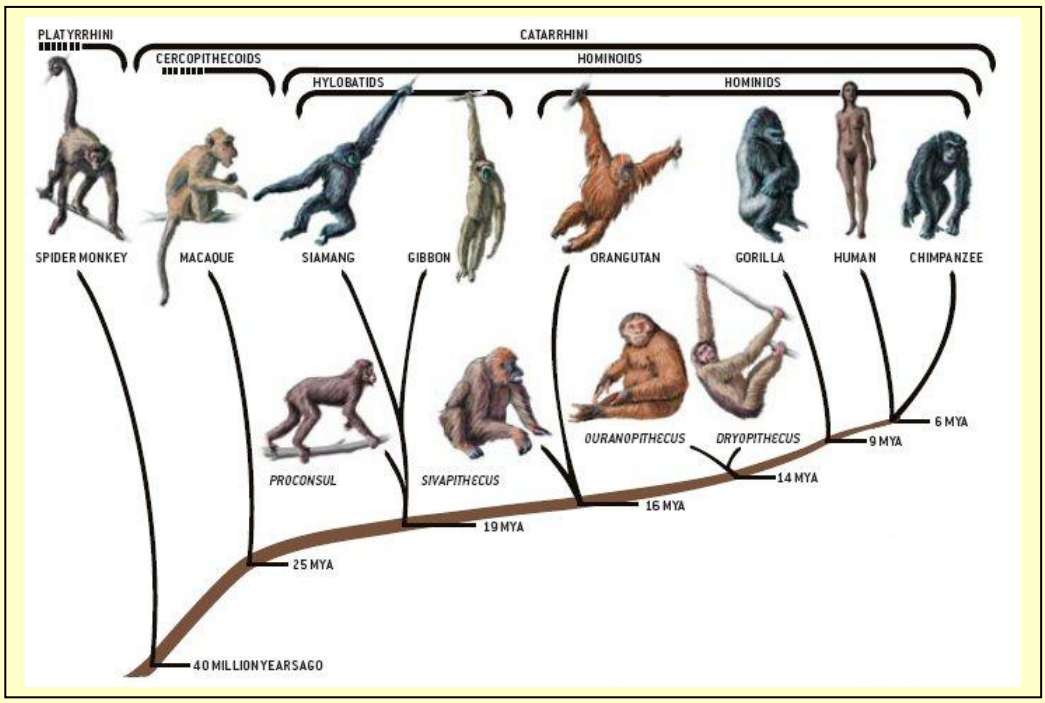

মিওসিন যুগের বেশীরভাগ এপই বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিজ্ঞানীরা এই যুগের আদি আদি প্রাইমেট প্রোকনসুল(Proconsul) প্রজাতিকে এখন হমিনয়েডদের সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। ফসিল রেকর্ডে এদের মোটামুটি সব হাড়েরই সন্ধান পাওয়া গেছে। সিভাপিথেকাস্কে ওরাং ওটাংদের পুর্বপুরুষ এবং ড্রাইওপিথেকাস বা ওরানোপিথেকাসকে হোমিনিডি অর্থাৎ মানুষ এবং বনমানুষের পুর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়।

আগে ভাবা হত ছাড়া হাতিয়ারের ব্যবহার কেবল 'মানবীয় বুদ্ধিমত্তা'র সাথে জড়িত। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে আনেক অঞ্চলের শিম্পাঞ্জী সরল হাতিয়ার তৈরি এবং তা ব্যবহার করতে সক্ষম। উপরের ছবিতে একটি শিম্পাঞ্জীকে পাথুরে অস্ত্র ব্যবহার করে বাদাম ভেঙে খেতে, আর পাশের ছবিতে আরেকটি শিম্পাঞ্জীকে লাঠির সাহায্যে উইপোকা ধরতে দেখা যাচ্ছে।

কয়েক দশকে আণবিক জীববিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্সের বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো বিবর্তনবাদকে অত্যন্ত জোড়ালো ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্সের মতে পৃথিবীতে যদি একটাও ফসিলের অস্তিত্ব না থাকতো তাহলেও জীবের বিস্তৃতির প্যাটার্ন এবং তাদের ডিএনএ-এর ভিতরে জিনের মধ্যে লেখা বংশগতীয় তথ্য থেকেই বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করা সম্ভব হতো।

এখন কোন সন্দেহ নেই যে আমরা আফ্রিকার এক ধরনের বনমানুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছি; জীবিত প্রজাতির মধ্যে শিম্পাঞ্জীরা আমাদের খুব কাছের আত্মীয়। কারণ আমরা একই পুর্বপুরুষ থেকে উদ্ভুত হয়ে দুটি ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়েছি। শারীরিক, আণবিক এবং ব্যবহারগত সাদৃশ্য থেকে পূর্ববর্তী বিবর্তনের ধারা সম্বন্ধে জানা গিয়েছে। বৈসাদৃশ্য গুলো (যেমন, মানুষ খাড়া হয়ে হাটতে পারে, তাদের বিবর্ধিত মস্তিস্কের আকার, তাদের ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ ইত্যাদি) আমাদের 'সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার' ক্ষেত্রে বিবর্তনের মাইলফলক গুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করছে।

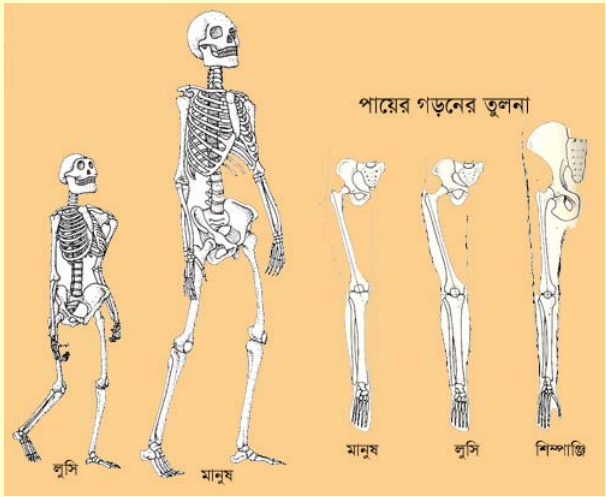

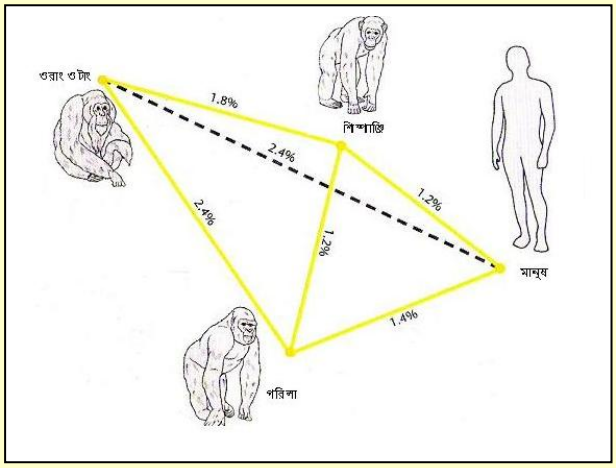

মানুষ শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং ওরাং ওটাং একই সাধারণ পূর্বপূরুষ থেকে ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়েছে। পাশের ছবিতে এদের মধ্যে জেনেটিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

গত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ বছরে অন্য সব জীবের মতই যেমন মানুষের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে তেমনি তাদের বেশিরভাগ প্রজাতি আবার বিলুপ্তও হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আজ *Homo sapiens* নামে আমাদের প্রজাতির মানুষই টিকে আছে, অন্যরা সবাই বিলুপ্তির পথ ধরে হারিয়ে গেছে।

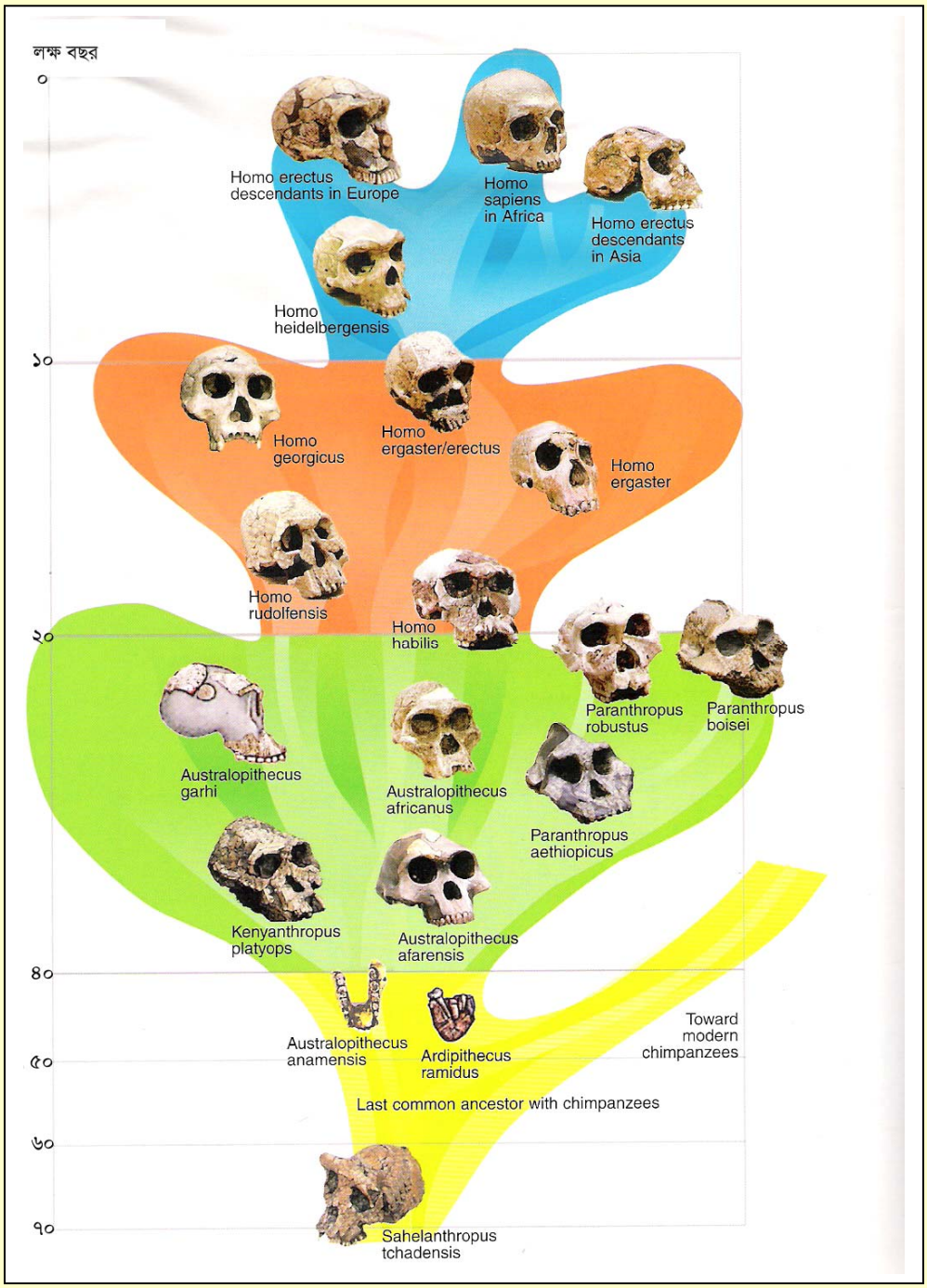

বহু প্রজাতির মানুষের পদচারণায় মুখরিত ছিল আমাদের এই পৃথিবী। ফসিল রেকর্ড থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞদের আঁকা বিভিন্ন প্রজাতির ছবি।

উপরে বত্রিশ লক্ষ বছর আগের *Australopethicus afarensis* প্রজাতির সদস্য ‘লুসি’র ছবি।

নীচে দেখা যাচ্ছে বিশ লক্ষ বছর আগের *Paranthropus boisei* প্রজাতির ছবি।

আধুনিক মানুষ; *Homo sapiens* (পাশে)।

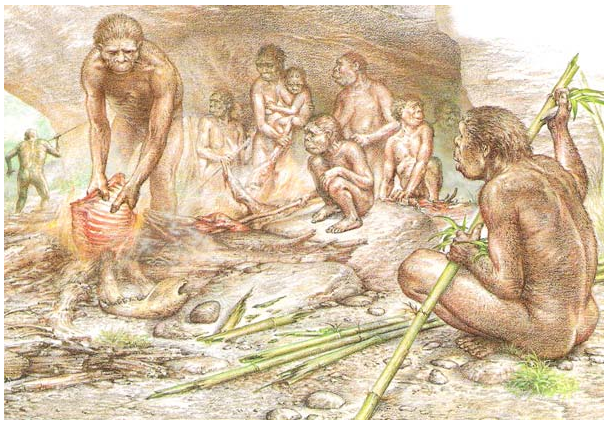

বিশ লক্ষ বছর আগের *Homo erectus* প্রজাতির সামাজিক জীবনযাত্রার ছবি।

Homo erectus-এর উত্তরসূরী মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে বিস্তৃত *Homo heidelbergensis* প্রজাতি। এরাই নিয়ান্ডারথাল প্রজাতির পূর্বপুরুষ।

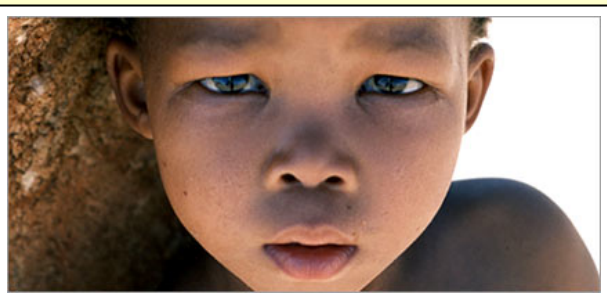

আমাদের পূর্বপুরুষেরা দুই লাখ বছর আগে আফ্রিকায় উদ্ভুত হয়ে ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মানুষের মধ্যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্য থাকলেও ডিএনএ-এর বিশ্লেষন থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সবাই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই বর্ণবৈষম্য, জাতিভেদ এগুলো প্রকৃতির নয় বরং মানুষেরই সৃষ্ট।

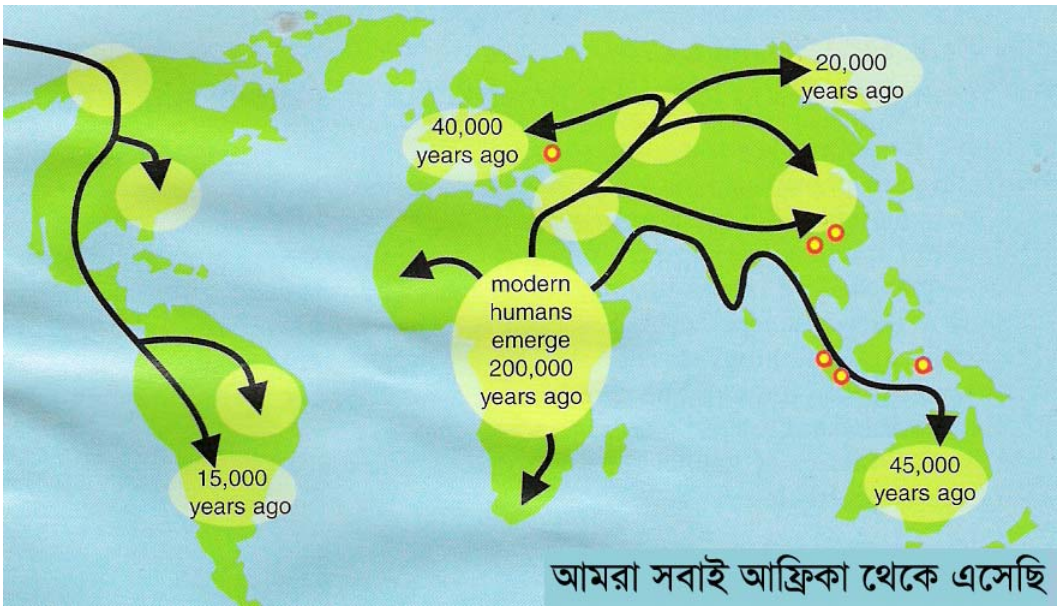

পৃথিবীতে যেমনিভাবে ডারউইনীয় বিবর্তন অনুযায়ী প্রাণের নান্দনিক বিকাশ ঘটেছে তেমনি এ মহাবিশ্বের বুকে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি গ্রহ কিংবা গ্রহাণুপুঞ্জের কোথাও কি প্রাণের বিকাশ ঘটেছে? আর ঘটে থাকলে তা কি ডারউইনীয় বিবর্তন তত্ত্বকে অনুসরণ করেই ঘটবে?